অবশ্য মন থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করছি নে, কারণ যেসকল ভাব সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পার থেকে উড়ে এসে আমাদের মনোজগতে জুড়ে বসেছে, তাদের বেবাক উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও তাতে মন উজাড় হয়ে যাবে। তবে যা জালে ওঠে তাই যেমন মাছ নয়, তেমনি যা ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে তাই গাছ নয়। বিলেতিজীবনে বিলেতিসাহিত্য যাচাই করে নিতে না পারলে এই বিদেশী ভাবের জঙ্গলের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উদ্যান গড়ে তুলতে পারব না। এই পরখ করবার কাজটি সম্ভবত বিলেতফেরতেরাই ভালো করতে পারবেন।

তবে সাহিত্যসমাজে প্রবেশ করতে এঁরা সহজে স্বীকৃত হবেন না। লিখতে অনুরোধ করবামাত্র এঁরা উত্তর করবেন যে, 'আমরা বাংলা লিখতে জানি নে'। কিন্তু ওকথা শুনে পিছপাও হলে চলবে না। সেকেলে বিলেতফেরতেরা বলতেন যে, তাঁরা বাংলা বলতে পারেন না। অথচ সে বিনয় কিংবা সে স্পর্ধা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আজ বিলেতফেরতের মুখে-মুখে পাওয়া যায়। হতে পারে যে বাংলা লিখতে পারি নে— একথা বলায় প্রমাণ হয় যে, বক্তা ইংরেজি লিখতে পারেন। অথচ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, সে ইংরেজি কোনো দেশী লোক লিখতে পারেন না। যাঁরা আদালতে এবং সভা-সমিতিতে ইংরেজিভাষায় ওকালতি এবং 'কলাবতী' করেন, তাঁরা যে ও-ভাষায় শুধু পড়া মুখস্থ দেন তা শ্রোতামাত্রেই বুঝতে পারে। আমরা আইন সম্বন্ধে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরেজরাজপুরুষের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য, সুতরাং ও-দুই ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা যার যত বেশি সে তত বড়-বড় প্রাইজ পায়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, ঐ প্রাইজের দৌলতে তাঁরা ইংরেজিসাহিত্যসমাজে প্রমোশন পান। সুতরাং সাহিত্যবস্তু যে কি, তা যিনি জানেন তাঁকে ইংরেজি ত্যাগ করে বাংলা লেখাতে প্রবৃত্ত করতে কিঞ্চিৎ সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হবে। বিলেতি বুট ত্যাগ করলে বঙ্গসন্তান যে স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই; তবে বুট ছেড়ে যদি পণ্ডিতি-খড়ম পরে বেড়াতে হয়, তাহলে অবশ্য আরও বিপদের কথা হবে। কিন্তু বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে খোলাপায়ে প্রবেশ করাটাই যে কর্তব্য এবং শোভন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেটি বোঝা উচিত। অবশ্য পণ্ডিতি-খড়মের প্রধান গুণ এই যে, তা যত বেশি খটখটায়মান হবে, লোকে তত 'সাধু সাধু' বলবে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আশৈশব ওবস্তুর ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে খড়মধারীদের পদে-পদে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য।

বিলেতফেরতকে লেখক তৈরি করার প্রধান বাধা হচ্ছে যে, তাঁরা অধিকাংশই

আইনব্যবসায়ী। উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব, যদিচ উভয়েই বাচাল। এর এককে দিয়ে অপরের কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই যে রাসবিহারী হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, এদেশের কত বিদ্যাবুদ্ধি আদালতের মাঠে মারা যাচ্ছে। তার কারণ, ও শুষ্ক এবং কঠিন ক্ষেত্রের রস আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, অনেকের মন তাতে শিকড়ও গাড়তে পারে না। এ অবস্থায় যে অনেকে আদালতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন, তার কারণ ও স্থান ত্যাগ করলে হাঁসপাতালে যাওয়া ছাড়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ীর আর গত্যন্তর নেই। তাই নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক এক ফোঁটা জল না খেয়ে দিনের পর দিন ন্যুব্জশিরে কুব্জপৃষ্ঠে অগাধ আইনের পুস্তকের ভার বহন করে আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে গুরুভারে পৃষ্ঠদণ্ড ভঙ্গ হলেও যে তাঁরা পৃষ্ঠভঙ্গ দেন না, তার আর-একটি কারণ এই যে, এই মরুভূমিতে তাঁরা নিত্য রজতমায়ার মরীচিকা দেখেন। সুতরাং এই আইনের দেশ একবারে ত্যাগ করতে কেউ রাজি হবেন না; তবে মধ্যেমধ্যে সবুজপত্রের ওয়েসিসে এসে বিশ্রামলাভ করতে এঁদের আপত্তি না-ও হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু সতর্ক থাকবেন যে, এমন লোক আপনার বেছে নেওয়া চাই যার মন ইংরেজের আইনের নজিরবন্দী হয় নি।

আমার শেষকথা এই যে, যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার নিজের দলের লোককে, আর-কোনো কারণে না হোক— আত্মরক্ষার জন্যও, আপনাকে লেখক তৈরি করে নিতে হবে; কারণ তাঁরা যদি লেখক না হন, তাহলে তাঁরা সব সমালোচক হয়ে উঠবেন। ইতি।

শ্রাবণ ১৩২১

LIBRARY

কৈফিয়ত

সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যের ছোট বড় মাঝারি সকলরকম সমালোচক আমার ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছেন। সে প্রতিবাদে নানাজাতীয় নানা পত্র মুখরিত হয়ে উঠেছে। সে মর্‌মর্‌-ধ্বনি শুনে আমি ভীত হলেও চমকিত হই নি; কেননা, আমি যখন বাংলা লেখায় দেশের পথ ধরে চলছি তখন অবশ্য সাহিত্যের রাজপথ ত্যাগ করেছি। যূথভ্রষ্ট লেখককে সাহিত্যের দলপতিরা যে ভ্রষ্ট বলবেন, এতে আর আশ্চর্য কি। বিশেষত সে রাজপথ যখন শুধু পাকা নয়— সংস্কৃতভাঙ্গা শুরকি বিলেতি-মাটি এবং চুন দিয়ে একেবারে শান-বাঁধানো রাস্তা। অনেকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যের এই সদর-রাস্তাই হচ্ছে একমাত্র সাধু পথ, বাদবাকি সব গ্রাম্য। তবে জিজ্ঞাস্যবিষয় এইটুকু যে, এই গ্রাম্যতার অপবাদ আমার ভাষার প্রতি সম্প্রতি দেওয়া হচ্ছে কেন। আমি প্রবীণ লেখক না হলেও নবীন লেখক নই। আমি বহুকাল ধরে বাংলা কালিতেই লিখে আসছি। সে কালির ছাপ আমার লেখার গায়ে চিরদিনই রয়েছে। আমার রচনার যে ভঙ্গিটি সহৃদয় পাঠক এবং সমজদার সমালোচকেরা এতদিন হয় নেক-নজরে দেখে এসেছেন, নয় তার উপর চোখ দেন নি— আজ কেন সকলে তার উপর চোখ-লাল করছেন। এর কারণ আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারি নি।

এখন শুনছি, সে ভাষার নবাবিষ্কৃত দোষ এই যে তা 'সবুজপত্রের ভাষা'। সবুজের, তা দোষই বল আর গুণই বল, একটি বিশেষ ধর্ম আছে। ইংরেজেরা বলেন, যে চোখে সে রঙের আলো পড়ে, সে চোখের কাছে অপরের কোনো দোষই ছাপা থাকে না। আমাদের দোষ যাই হোক, তা যে গুণীসমাজে মারাত্মক বলে বিবেচিত হয়েছে, তার প্রমাণ এই যে, পরিষৎ-মন্দিরে স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'সবুজপত্রের ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন'। এ সংবাদ শুনে উক্ত পত্রের সম্পাদকের নিশ্চয়ই হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। পালমহাশয়ের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি যার লেখা আলোচনার যোগ্য মনে করেন, তার কলম-ধরা সার্থক; কেননা, ওতেই প্রমাণ হয় যে, তার লেখায় প্রাণ আছে। যা মৃত, একমাত্র তাই নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত। অপরপক্ষে বিষণ্ণ হবার কারণ এই যে, 'যেষাং পক্ষে জনার্দন' সেই পাণ্ডুপুত্রদের জয় এবং সবুজপত্রের পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী।

পালমহাশয় যে সবুজপত্রের ভাষার উপর আক্রমণ করেছেন, এ রিপোর্ট নিশ্চয়ই ভুল: কেননা, ও-পত্রের কোনো বিশেষ ভাষা নেই। উক্ত পত্রের ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের

রচনার পদ্ধতি ও রীতি সবই পৃথক। পদের নির্বাচন ও তার বিন্যাস প্রতি লেখক নিজের রুচি অনুসারেই করে থাকেন। কাল যখন কলি, তখন লেখবার কলও নিশ্চয় রচিত হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সবুজপত্রের সম্পাদক যে সে-কলের সন্ধানলাভ করেছেন, এমন তো মনে হয় না। সকলের মনোভাব আর-কিছু একই ভাষার ছাঁচে ঢালাই করা যেতে পারে না। মানুষের জীবনের ও মনের ছাঁচ তৈয়ারি করা যাঁদের ব্যাবসা, তাঁরা অবশ্য একথা স্বীকার করবেন না; তা হলেও কথাটি সত্য। 'সংগচ্ছদ্ধং' এই বৈদিক বিধির কর্মজীবনে যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্তু 'সংবদদ্ধং' এই বিধির সাহিত্যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা নেই। এই কারণেই সাহিত্যের প্রতি-লেখককেই তাঁর নিজের মনোভাব নিজের মনোমত ভাষায় প্রকাশ করবার স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। 'সবুজপত্রে' লেখকদের সে স্বাধীনতা যে আছে, তা উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সবুজপত্রের নয়, আমার ভাষার উপরেই পালমহাশয় আক্রমণ করেছেন। আমার ভাষার রোগ মারাত্মক হতে পারে, কিন্তু তা সংক্রামক নয়। এক সবুজপত্রের সম্পাদক ব্যতীত আর-কেউই আমার পথানুসরণ কিংবা পদানুকরণ করেন না। পালমহাশয় বঙ্গসাহিত্যের সর্বোচ্চ আদালতে আমার ভাষার বিরুদ্ধে যে নালিশ রুজু করেছেন, সম্ভবত তার একতরফা ডিক্রি হয়ে গেছে, কেননা, সে সময়ে আমি সেক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলুম না। উপস্থিত থাকলে যে মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়ে নিতে পারতুম, তা নয়। পালমহাশয় বাক্যজগতে মহাবলী এবং মহাবলিয়ে। আমার এতাদৃশ বাক্‌পটুতা নেই যে, আমি তাঁর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হই। আরজি যদি লিখিত হয়, তা হলে হয় তার লিখিত-জবাব নয় কবুল-জবাব দেওয়া যায়। কিন্তু বক্তৃতা হল ধূম জ্যোতি সলিল ও মরুতের সন্নিপাত। উড়ো-কথার সঙ্গে কোন্দল করতে হলে হাওয়ায় ফাঁদ পাতা আবশ্যক; সে বিদ্যে আমার নেই। তবে পালমহাশয় যখন এদেশের এ যুগের একজন অগ্রগণ্য গুণী, তখন তিনি আমাদের ন্যায় নগণ্য লেখকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত করলে আমরা তার কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।

সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট থেকে ঠিক বোঝা গেল না যে, আমার ভাষার বিরুদ্ধে পালমহাশয়ের অভিযোগটি কি। আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি যে, আমার ভাষা আর-পাঁচজনের ভাষা হতে ঈষৎ পৃথক। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য দোষ বলে গণ্য হতে পারে না। 'কিং স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে'— এ ধমক সাহিত্যসমাজে কোনো গুরুজন কোনো ক্ষুদ্রজনকে দিতে যে অধিকারী নন, পালমহাশয়ের ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তা কখনোই অবিদিত নেই। তার পর কেউ-কেউ বলেন যে, আমি খাঁটি

বাংলার পক্ষপাতী। কোনোরূপ খাঁটি জিনিসের পক্ষপাতী হওয়াই যে দোষ, একথাও বোধ হয় কেউ মুখ ফুটে বলবেন না; বিশেষত যখন সে পদার্থ হচ্ছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষার শক্তির উপর বিশ্বাস থাকাটাও যে একটা মহাপাতক— একথা আর যেই বলুন না কেন, পালমহাশয় কখনো বলতে পারেন না। তবে খাঁটিমাল বলে যদি ভেজাল চালাবার চেষ্টা করি, তা হলে অবশ্য তার জন্য আমার জবাবদিহি আছে। যার সঙ্গে যা মেশানো উচিত নয়, গোপনে তার সঙ্গে তাই মেশালে ভেজাল হয়। ভেজালের মহা দোষ এই যে, তা উদরস্থ করলে মন্দাগ্নি হয়। কিন্তু আমার ভাষা যে কারও-কারও পক্ষে অগ্নিবর্ধক, তার প্রমাণ এই যে, তা গলাধঃকরণ করবামাত্র তাঁরা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। সে যাই হোক, মণিকাঞ্চনের যোগ সাহিত্যে নিন্দনীয় নয়। সোনার-বাংলায় সংস্কৃতের হীরামানিক আমি যদি বসাতে না পেরে থাকি, তা হলে সে আমার অক্ষমতার দরুন; আমি কারিগর নই বলে যে সাহিত্যে জড়াও-কাজ চলবে না, তা হতেই পারে না। খাঁটি সংস্কৃত যে খাঁটি বাংলার সঙ্গে খাপ খায়, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার গায়ে আল্‌গা হয়ে বসে শুধু ইংরেজিভাঙা হাল সংস্কৃত, ওরফে সাধুশব্দ। আমার ভাষা নাকি কল্‌কাত্তাই ভাষা। সুতরাং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে তা আক্রমণ করা সহজ। অপরপক্ষে সাধুভাষার জন্মস্থান হচ্ছে ফোর্ট উইলিঅমে, সুতরাং তাকে আর আক্রমণ করা চলে না— সে যে কেল্লার ভিতরে বসে আছে।

শুনতে পাই যে, পাল মহাশয়ের মতে আমার ভাষার প্রধান দোষ এই যে, তা দুর্বোধ। লিখিত ভাষা যে পরিমাণে মৌখিক ভাষার অনুরূপ হয়, সেই পরিমাণে যে তা দুর্বোধ হয়ে ওঠে— এ সত্য আমার জানা ছিল না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন যে, সাধুভাষা লেখা সহজ। একথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে যে আমি সাধুভাষার এই সহজ পথ ত্যাগ করে 'ভাষামার্গে ক্লেশ' করি, তার কারণ আমার ধারণা যে, বাঙালি পাঠকের কাছে চলিত ভাষা সহজবোধ্য। যে প্রসাদগুণের আরাধনা করার দরুন আমি সমালোচকদের প্রসাদে বঞ্চিত হয়েছি, সেই গুণের অভাবই যে 'অসাধুভাষা'র প্রথম এবং প্রধান দোষ, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। অতএব আমার ভাষার যে এ দোষ আছে তা আমি বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে পারি নি। তবে যদি পাঠক পড়বার সময় সে ভাষা মনে-মনে ইংরেজিতে তরজমা করে নিতে পারেন না বলে তার অর্থগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়, তা হলে অবশ্য আমার রচনা দুর্বোধ্য।

লোকে বলে, পাঁজি যখন হাতে আছে তখন বারটি মঙ্গল কি শনি সেবিষয়ে

তর্ক করার অর্থ শুধু সময় এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যয় করা। আমি তাই আমার এবং পালমহাশয়ের লেখার নমুনা পাশাপাশি ধরে দিচ্ছি, পাঠকেরা বিচার করবেন যে, কোন্ অংশে আমার ভাষা বাদীর ভাষা অপেক্ষা অধিক দুর্বোধ। আমাদের উভয়েরই বক্তব্যবিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ভাষার তারতম্য সহজেই চোখে পড়বে।—

'যৌবনে দাও রাজটিকা'

॥ বীরবল ॥

এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল— দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। ··সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন ; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক।···আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া— কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন।

২

মনুষ্যত্ব খর্ব ক'রে মানবসমাজটাকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না।

৩

দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি।··সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। — সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

যৌবনে কৃষ্ণকথা

॥ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ॥

অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন 'যৌবন বিষম কাল', কিন্তু চারুপাঠ পড়িয়াও আমরা যৌবনের বিষমত্বটা অনুভব করি নাই। আজিকালিকার নবযুবক-দিগকে দেখিয়া মনে হয় যেন এদেশ হইতে বসন্তের মতন যৌবনও একরূপ চিরবিদায় লইয়াছে।···চক্ষে দেখি তিনটা ঋতু— গ্রীষ্ম বর্ষা আর শীত। কিন্তু বসন্তের সাক্ষাৎকার পাওয়া একরূপ অসাধ্য। সেইরূপ এদেশে মানুষের জীবনেও বাল্য প্রৌঢ় ও বার্ধক্য— এই তিন কালই দেখা যায়। বাল্য ফুরাইতে না ফুরাইতে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২

টবেতে বড় গাছ জন্মায় না ও বাড়ে না, সেরূপ এক একটা ধর্মের ও নীতির টব সাজাইয়া মানুষগুলোকে তাতে পুঁতিয়া রাখিলে তাদের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না।

৩

যেসকল যুবক এই যৌবনের সংকেত পাইয়াছিলেন, তাঁরা আজি পর্যন্ত তেমন বুড়া হইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির যৌবন আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। কর্মবীর অশ্বিনীকুমার ও সুরসিক মনোরঞ্জন, ইঁহাদের দেখিয়া বয়সের সঙ্গে যৌবনের কোনও অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে, এমন মনে হয় না। এঁরা এখনও যৌবনের জের টানিতেছেন। — প্রবাহিণী, ৯ শ্রাবণ ১৩২১

এর কোন্ পাশে আলো আর কোন পাশে ছায়া, তার বিচার পাঠকসমাজই করবেন।

ধ্বনির অপেক্ষা প্রতিধ্বনি যদি বেশি স্পষ্ট হয়, তা হলে অবশ্য পালমহাশয়ের ভাষা আমার ভাষা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট।

আসল কথা, ভাষার বিচার শুধু বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়, যদি-না আমরা ধরতে পারি যে, তথাকথিত সাধুভাষার সঙ্গে তথাকথিত অসাধুভাষার পার্থক্যটি কোথায় এবং কতদূর।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন যে, আর পাঁচজনে যে ভাষায় লেখেন, আমিও সেই একই ভাষায় লিখি; তফাত এইটুকু যে, ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের ব্যবহার আমি মৌখিক ভাষার অনুরূপই করে থাকি। চন্দমহাশয়ের মত আমি শিরোধার্য করি; কেননা, তাঁর একথা সম্পূর্ণ সত্য।

আমি 'তাহার' পরিবর্তে 'তার' লিখি, অর্থাৎ সাধু সর্বনামের হৃদয়ের হা বাদ দিই। 'হায় হায়' বাদ দিলে বাংলার যে পদ্য হয় না, তা জানি; কিন্তু 'হা হা' বাদ দিলে যে গদ্য হয় না, এ ধারণা আমার ছিল না এবিষয়ে কিন্তু পালমহাশয় আমার সঙ্গে একমত; কেননা, তাঁর লেখাতেও উক্ত 'হা' উহ্য থেকে যায়।

শেষটা দাঁড়াল এই যে, পালমহাশয়ের ভাষার সঙ্গে আমার ভাষার যা-কিছু প্রভেদ, তা হচ্ছে ক্রিয়ার বিভক্তিগত। আমি লিখি 'করে', তিনি লেখেন 'করিয়া'। 'করে'র বদলে 'করিয়া' লিখলেই যে ভাষা সুমার্জিত হয়ে ওঠে, এ বিশ্বাস আমার থাকলে আমি সাহিত্যে সাধুপথ কখনোই ত্যাগ করতুম না। আমার বিশ্বাস, অত সস্তা উপায়ে সুলেখক হওয়া যায় না, কেননা এক স্বরবর্ণের গুণে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি তাদৃশ বৃদ্ধিলাভ করে না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর অভিভাষণে বলেছেন যে, 'এ এ' আর 'ইয়ে ইয়ে' এ দুয়ের ভিতর ভাষার কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ যা আছে তা বানানের। একথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা সত্য, তা হলে পালমহাশয়ের আমার ভাষার উপর যে আক্রমণ, তা আসলে বানানের উপরে গিয়েই পড়েছে। বানান আমার কাছে চিরদিনই একটি মহা সমস্যা, এবং সে সমস্যার উত্তর-মীমাংসা করা আমার সাধ্যের অতীত। অসাধুভাষার বিপদ যেমন এই বানানের দিকে, সাধুভাষারও বিপদ তেমনি বানানোর দিকে। ও ভাষায় লিখতে বসলে যখন পালমহাশয়ের চাঁচা কলমের মুখ ফসকে 'আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল' এইরূপ বাক্য বেরিয়ে পড়ে, তখন আমার কাঁচা কলমের উপর ভরসা কি? এহেন সাধুহস্ত হতে মুক্তিলাভ না করলে বঙ্গসরস্বতী 'আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়া' নয়, মরিয়াই থাকিবে।

আশ্বিন ১৩২১